প্রশ্ন :- বাংলা ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের কারণগুলি উল্লেখ কর, তৎসহ ধ্বনি পরিবর্তনের ধারাগুলির পরিচয় দাও এবং এ প্রসঙ্গে অপিনিহিতি, স্বরসঙ্গতি এবং সমীভবন বিষয়ে টীকা লেখ ।

ভূমিকা:- বাংলা একটা প্রাণবন্ত চলমান ভাষা । বহু বছরের ধীর ও ধারাবাহিক বিবর্তনে বাংলা ভাষার বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণের মূল ধ্বনির নানা পরিবর্তন ঘটেছে । ধ্বনির পরিবর্তনশীলতা বাংলা ভাষাকে আরো আন্তরিক ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে । এই পরিবর্তনের পিছনে যে যে কারণগুলি রয়েছে সেগুলি হল —(১) ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু, (২) উচ্চারণে অসাবধানতা ও উচ্চারণ-কষ্ট লাঘবের জন্য ,(৩) অন্য কোনো ভাষার প্রভাবের জন্য , (৪)শ্রবণ ও বোধের ত্রুটির জন্য এবং সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব জনিত কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে ।

ধ্বনি পরিবর্তনের কারন:

বাংলা ব্যাকরণের আলোচনায় ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা নানা সময় নানা শব্দ ব্যবহার করি। বিভিন্ন কারণে সেইসব শব্দের উচ্চারণগত নানা রূপ পরিবর্তন ঘটে। কী সেই কারণ ? এই অংশে ধ্বনির পরিবর্তনের নানা কারণগুলি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ধ্বনি পরিবর্তন কী ?

চলমান জীবন প্রবাহে পরিবর্তনশীলতা একটি বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য, আর সেই পরিবর্তনশীলতাকে মানুষ প্রকাশ করে তার মৌখিক ভাষার মাধ্যমে, তাই তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যে কোনো প্রচলিত মৌখিক ভাষাই পরিবর্তনশীল। ছোটবেলায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক মহাশয়ের আলোচনায় বার বার এসেছে “কোনো জাতির মৌখিক ভাষা বহমান নদীর মতো” তখন কথাটি একটি প্রবাদ বাক্যের মতো কানে বাজত, কিন্তু সাহিত্যের ছাত্র হওয়ায় ক্রমশ সেই প্রবাদের গূঢ় রহস্য ভেদ হচ্ছে, – নদী যেমন সময়ের সাথে সাথে এলো মেলো ভাবে তার চলার পথ বদলায়, তেমনি যুগ থেকে যুগান্তরে তার প্রকৃতি বদলায়, নদী বদলায় তার স্রোত, ভাষা বদলায় তার ধ্বনি। নদীর স্রোত ভিন্নমুখী হলে যেমন নদীর গতিপথ বদলায়, তেমনি কালক্রমে মূল ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন হতে হতে নতুন ভাষার পরিচিতি পায়, যা মান্য ভাষার অন্তর্গত কিন্তু অন্য নাম নিয়ে বাস্তবে ও ভাষার আলোচনায় আলোচিত হয় ।

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

একটি ভাষার ধ্বনি বিভিন্ন কারণে পরিবর্তন হতে পারে, দেখি কীভাবে তা পরিবর্তিত হচ্ছে –

১) ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণ

ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণে ধ্বনি পরিবর্তন নির্ভর করে -ভৌগোলিক অবস্থানের কারণের ওপর জলবায়ু নির্ভর করে এবং তারফলে শারীরিক গঠন ও অভিযোজন প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। এই জন্য পার্বত্যাঞ্চলের মানুষের ও সমতলের উচ্চারণের পার্থক্য লক্ষকরা যায়। যে অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি প্রতিকূল ও কঠোর, সেখানকার উচ্চরণ বেশি কঠোর ও কর্কশ এবং যেখানের ভূপ্রকৃতি বৈচিত্রময়, নির্মল, সেখানকার ভাষার উচ্চারণে কমলতলা সৌন্দর্য্যতা বেশি – যেমন -ইংরাজি ও জার্মান ভাষা অপেক্ষাকৃত রূঢ় ভাষা আর ফরাসি স্পেন, ইতালীয় , ইতালীয় ভাষা অপেক্ষাকৃত মধুর ও কমল,- অনেক ভাষাবিদ এই ধারনা পোষণ করেন।

২) সমাজিক অবস্থান

শান্তিপূর্ণ অবস্থানে কোনো দেশের ভাষার উচ্চরণগত বিকৃত কম থাকে। কিন্তু যে দেশে যুদ্ধ – বিগ্রহ অথবা বিদেশীদের আগমন ক্রমাগত হতেই থাকে, সেখানকার ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের সম্ভাবনা বেড়েই যায়। আমাদরে ভারতবর্ষের কথাই যদি ধরি – নিয়মিত বিদেশীদের আগমনে ও যোগাযোগের ফলে ভাষার যে ধ্বনিগত পরিবর্তন হয়েছে তা লক্ষণীয়।

যেমন, শ, স, ষ, এই তিন ধরনের শিসধ্বনি পশ্চিমবঙ্গের মান্য চলিত ভাষার মধ্যে থাকলেও মূল ধ্বনি হিসেবে মান্যতা পেয়েছে “তালব্য – শ “ই। কিন্তু এই বাংলা ভাষাভাষীর বাংলদেশে “দন্ত্য -স ” দারুণ ভাবে প্রচলিত। এঁর কারণ হিসেবে ভাষাবিদদের যুক্তি – মধ্যযুগ থেকেই মুসলমান শাসনের ফলে ফরাসি ভাষার প্রভাবে এই ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে ।

৩) অন্য ভাষার সাহচর্যজনিত কারণ

বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে বাংলা ভাষা আসার সূত্রে তার নিজেস্ব ভাষা কিছু কিছু বদলে গেছে। যেমন – বাংলা ‘বন্ধ’ শব্দটি হিন্দি ভাষার প্রভাবে ‘বন্ধ্ ‘ অথবা ‘বন্‌ধ্’।

সাধরণ বাংলা বাক্যের ভেতরেই এই রকম অন্য ভাষার প্রভাব থেকে গেছে। যেমন – নেতাজী সুভাষ অমর রহে “

৪) শারীরিক কারণ

মানুষে ভাব বিনিময়ের সবথেকে শক্তিশালী মধ্যম হলো পঞ্চ ইন্দ্রীয়। এই ইন্দ্রীয় গুলির কোনো একটির ত্রুটি থাকলে ধ্বনি পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

(ক) বাকযন্ত্রের ত্রুটিজনিত কারণ – বাক্য বিনিময়ের ক্ষত্রে যদি বক্তার জিহ্বার সমস্যা থাকে তাহলে উচ্চারণে মূর্ধণ্যীভবন। যেমন – সেই বক্তা “দিন দুনিয়ার হাল বদলে গেছে, বলতে গিয়ে বলেন – ” ডিন ডুনিয়ার হাল বডলে গেঠে”।

(খ) শ্রোতার শ্রবণ ত্রুটিজনিত কারণ : শ্রোতার শ্রবণ সমস্যা থাকলে বক্তার বক্তার প্রকৃত উক্তি শ্রোতার কানে প্রকৃত উচ্চরণ বিকৃত ভাবে পৌঁছয় এবং তা উচ্চরণ কালে বিকৃত উচ্চরণই হয়ে যায়। যেমন – ‘zar’ শব্দটির উচ্চরণ ‘তসার ‘ ভালভাবে না শুনতে পেয়ে ‘জার ‘নামক ভুল উচ্চরণ করেন। পরবর্তীকালে সেই ভুলটাই প্রচলিত হয়ে যায়, এ যেন লোকনিরুক্তির আর এক রূপ ।

(গ) অশিক্ষা জনিত কারণ – অশিক্ষিত মানুষরা শব্দের প্রকৃত উচ্চরণ না জানার ফলে অথবা জানা শব্দই চর্চার অভাবে কঠিন শব্দ সহজ করে উচ্চরণ করার প্রবণতা থাকে। ‘নীলদর্পণ ‘ নাটকে আদুরি ‘ ম্যাজিষ্টেট সাহেব ‘ উচ্চরণ করতে না পেরে ‘মাছের টক’ বলে উচ্চরণ করেছে। অনুরূপ ভাবে – ‘গভর্নমেন্ট ‘ কে ”গর্মেন্ট ‘ বলেন ।

(জ) সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব :- সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাবে বিজাতীয় ব্যঞ্জন এক ব্যঞ্জনের পরিণত হয়, যেমন – ‘রশ্মি ‘ শব্দ ‘রশ্ শি ‘ তে যখন পরিণত হয়, তখন “ম ” ধ্বনি ‘শ’ ধ্বনিতে পরিণত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ধ্বনির এই বিচিত্র পরিবর্তন আশ্চর্য্যের নয়, অতি পরিচিত শব্দের এই ক্রমপরিবর্তন দেখে নাক - মূখ কুঁচকে নিজের অসন্তোষকে চেপে না রেখে মেনে নিতে শিখতে হবে। মনে রাখতে হবে, একটি ভাষা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানুষের মুখে যুগ যুগ ধরেবেঁচে থাকার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো এই ধ্বনিপরিবর্তন। যেকোনো ভাষার শব্দকে চিরশুদ্ধ করে ভাষায় ব্যবহার করার প্রয়াস করা বোকামী ছাড়া কিছু না। যদি তাই হয় তাহলে সেই ভাষার স্থান হবে (সংস্কৃত ভাষার মতো) মানুষের মুখে নয়,ইতিহাসে।

শ্রেণীবিভাগ—এই সমস্ত কারণ গুলি মাথায় রেখে ভাষা বিজ্ঞানীরা ধ্বনি পরিবর্তনকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন । এগুলি হল —

(১) ধ্বনির আগম বা ধ্বন্যাগম

(২) ধ্বনির লোপ বা ধ্বন্যালোপ

(৩) ধ্বনির স্থানান্তর

(৪) ধ্বনির রূপান্তর ।

(১) ধ্বনির আগম বা ধ্বন্যাগম (Sound Addition) — উচ্চারণকে সহজ ও সরল করবার জন্য বা উচ্চারণের অক্ষমতার জন্য যখন কোন শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে নতুন কোনো ধ্বনির আগমন ঘটে, তখন সেই জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তনকে ধ্বন্যাগম বলে । এই ধ্বন্যাগম দুই প্রকারের যথা (i) স্বরাগম ও (ii) ব্যঞ্জনাগম ।

(i) স্বরাগম (Vowel Addition) :- শব্দের প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে যখন কোনো স্বরবর্ণের আগমন ঘটে তখন তাকে স্বরাগম বলে । স্বরাগম তিন প্রকারের—

(ক) আদি স্বরাগম (Vowel Prothesis)— যেমন স্পর্ধা > আস্পর্ধা, স্টেশন > ইস্টিশন, স্টেট > এস্টেট। অর্থাৎ শব্দের প্রথমে আ, ই, এ ধ্বনির আগমন ঘটেছে।

(খ) মধ্য স্বরাগম (Vowel Insertion)— শ্লোক > শোলোক, রত্ন > রতন, প্রীতি > পিরীতি -এখানে শব্দের মধ্যে ও, অ , ই ধ্বনিগুলির আগমন ঘটেছে।

(গ) অন্ত স্বরাগম (Vowel Catathesis)— বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি, ল্যাম্প > ল্যাম্পো প্রভৃতি -এখানে ই, ও অ স্বরধ্বনি গুলো শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

(ii) ব্যঞ্জনাগম (Consonant Addition) শব্দ মধ্যে যখন ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটে তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে ব্যঞ্জনাগম। ব্যঞ্জনাগম ও তিন প্রকার — (ক) আদি, (খ) মধ্য ও (গ) অন্ত ব্যঞ্জনাগম।

(ক) আদি ব্যঞ্জনাগম (Consonant Prothesis)—উজু > রুজু , ওঝা > রোজা , এখানে শব্দের আদিতে 'র' এর আগমন ঘটেছে।

(খ) মধ্য ব্যঞ্জনাগম (Glide Insertion)— অম্ল > অম্বল, বানর > বান্দর, পোড়ামুখী > পোড়ারমুখী প্রভৃতি। এখানে ব, দ, র ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি শব্দের মধ্যে এসেছে।

(গ) অন্ত ব্যঞ্জনাগম (Consonant Catathesis)— সীমা > সীমানা , ধনু > ধনুক, নানা > নানান - শব্দের শেষে 'না', 'ক', 'ন' বর্ণের আগমন ঘটে শব্দগুলিকে সরলীকরণ করা হয়েছে।

(২) ধ্বন্যালোপ (Segment Loss)— ধ্বনির আগমন ঘটিয়ে যেমন ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে ধ্বনির লোপ ঘটিয়ে শব্দের কাঠিন্য ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যুগ্মশব্দ বা বড় বড় শব্দগুলিকে সরলীকরণ করে ছোট করা হয়েছে। ধ্বনিলোপ দুই প্রকারের যথা — (i) স্বরলোপ ও (ii) ব্যঞ্জনলোপ। স্বরলোপ আবার তিন প্রকারের যথা — (ক) আদি স্বরলোপ , (খ) মধ্য স্বরলোপ ও (গ) অন্ত স্বরলোপ।

(ক) আদি স্বরলোপ (Aphesis)— যেমন অলাবু > লাউ, অভ্যন্তর > ভিতর, উদ্ধার > ধার। এখানে প্রথম ধ্বনিগুলো লোপ পেয়েছে।

(খ) মধ্য স্বরলোপ (Syncope)— যেমন গামোছা > গামছা, ভগিনী > ভগ্নী , জানালা > জানলা। এইসব শব্দের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনি গুলির লোপ হয়েছে।

(গ) অন্ত্য স্বরলোপ (Apocope)— যেমন আশা > আশ, জলপানি > জলপান, কালি > কাল, ফাঁসি > ফাঁস প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্থিত স্বরধ্বনিগুলি লোপ পেয়েছে।

এই রকম ভাবে শব্দের মধ্য ও অন্তে ব্যঞ্জনধ্বনির ও লোপ ঘটিয়ে শব্দের কাঠিন্য ভেঙে সরলীকরণ ও সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে। আদি ব্যঞ্জনালোপের ব্যবহার বাংলা ভাষায় তেমন প্রচলন নেই কিন্তু মধ্য ও অন্ত ব্যঞ্জনলোপের উদাহরণ বহু রয়েছে। যেমন— মরছে > মচ্ছে, নবধর > নধর , গোষ্ঠ > গোঠ প্রভৃতি শব্দের মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনগুলি লুপ্ত হয়েছে। আবার মালদহ > মালদা, আল্লাহ > আল্লা, ছোটকাকা > ছোটকা, আলোক > আলো প্রভৃতি শব্দে শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়েছে।

(৩) ধ্বনির স্থানান্তর :- শব্দমধ্যস্থ একাধিক স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি বিভিন্নভাবে স্থান পরিবর্তন করে যখন তখন তাকে বলা হয় ধ্বনির স্থানান্তর। এই স্থানান্তর প্রধানত দুই প্রকার যথা— (ক) অপিনিহিতি ও (খ) ধ্বনি বিপর্যয় বা বিপর্যাস।

(ক) অপিনিহিতি [Epenthesis] —শব্দ মধ্যস্থ ব্যঞ্জনধ্বনির পর যদি ই-কার বা উ-কার থাকে, তবে সেই ই-কার বা উ-কার ঐ ব্যঞ্জনধ্বনির আগে উচ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অপিনিহিতি বলে। যেমন —আজি > আইজ, কালি > কাইল, সাধু > সাউধ, আশু > আউস প্রভৃতি (আ + জ + ই > আ + ই + জ)। এছাড়া য-ফলা যুক্ত শব্দ বা 'ক্ষ', 'জ্ঞ' থাকলেও ই-কার আগে উচ্চারিত হয়। বাক্য > বাইক্য, লক্ষ্ > লইক্ষ কন্যা > কিইন্যা প্রভৃতি। অপিনিহিতি বাংলার বঙালী উপভাষায় প্রচলিত বৈশিষ্ট্য। এই বঙালী উপভাষা বাংলাদেশে প্রচলিত হয় বেশি।

(খ) ধ্বনি বিপর্যয় বা বিপর্যাস [Metathesis} —উচ্চারণের সময় অসাবধানতাবশত বা অক্ষমতার কারণে শব্দ মধ্যস্থ সংযুক্ত বা পাশাপাশি দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির স্থান পরিবর্তন করার ঘটনাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন বাক্স > বাস্ক, পিশাচ > পিচাস, বাতাসা > বাসাতা, তলোয়ার > তরোয়াল, দহ > হ্রদ, রিকশা > রিশকা প্রভৃতি।

(৪) ধ্বনির রূপান্তর:- শব্দ মধ্যস্থ একটি স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি রূপান্তরিত হয়ে যথাক্রমে অন্য কোনো স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে ধ্বনির রূপান্তর বলে। রূপান্তর তিন প্রকার যথা—(ক) স্বর সংগতি [Vowel Harmony], (খ) অভিশ্রুতি [Umlaut] ও (গ) সমীভবন বা ব্যঞ্জন সংগতি [Assimilation]।

(ক) স্বরসংগতি (Vowel Harmony) —শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত দুটি পৃথক স্বরধ্বনির মধ্যে যদি একটি অন্যটির প্রভাবে বা দুটিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম স্বরধ্বনিতে বা প্রায় একই রকম ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে স্বরসংগতি বলে। স্বরসংগতি তিন রকমের, যথা — (i) প্রগত স্বরসংগতি , (ii) পরাগত স্বরসংগতি ও (iii) অন্যোন্য বা পারস্পরিক স্বরসংগতি।

(i) প্রগত স্বরসংগতি— যেমন পূজা > পূজো, দুর্বা > দুর্বো, ঠিকা > ঠিকে, নৌকা > নৌকো প্রভৃতি শব্দে পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি প্রভাবিত হয়েছে।

(ii) পরাগত স্বরসংগতি [Regressive] —এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি প্রভাবিত হয়ে একই রকম বা প্রায় কাছাকাছি একই রকম ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, যেমন শুনা > শোনা, নাই > নেই, শিখে > শেখে, বিলাতি > বিলিতি, বেটি > বিটি প্রভৃতি।

(iii) অন্যোন্য বা পারস্পরিক স্বরসংগতি [Mutual]— পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুটি স্বরধ্বনির পরস্পরের প্রভাবে উভয় ধ্বনি প্রভাবিত হয়ে একই রকম বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তখন সেই প্রক্রিয়াকে অন্যোন্য স্বরসংগতি বলে। যেমন— যদু > যোদো, মোজা > মুজো, গুণা > গোণা, মধু > মোধু প্রভৃতি।

(খ) অভিশ্রুতি (Umlaut)—অভিশ্রুতি হল অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপ। পশ্চিমবঙ্গের চলিত বাংলা ভাষায় এর প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি। অপিনিহিতি, স্বরসংগতি ও স্বরলোপ জনিত অনেকগুলি পরিবর্তনের পরিণাম হল অভিশ্রুতি। অর্থাৎ অপিনিহিতি সৃষ্ট কোনো শব্দ যখন ধ্বনিলোপ, স্বরসংগতি প্রভৃতি একাধিক ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে মান্য চলিত ভাষায় ব্যবহারের উপযোগী সংক্ষিপ্ত রূপ লাভ করে, তখন সেই সম্মিলিত ধ্বনি পরিবর্তন কে বলে অভিশ্রুতি। যেমন— রাখিয়া > রাইখিয়া (অপিনিহিতি), রাইখিয়া > রাইখিয়ে (স্বরসংগতি). রাইখিয়ে > রেখে (অভিশ্রুতি)। পটুয়া > পউটা > পোটো, কন্যা > কইন্যা > কনে , বেদিয়া > বাইদ্যা > বেদে , কলিকাতা > কইলকাতা > কোলকাতা প্রভৃতি।

(গ) সমীভবন বা সমীকরণ বা ব্যঞ্জন সংগতি [Assimilation] — শব্দমধ্যস্থ্য বা পাশাপাশি অবস্থিত দুটি পৃথক পৃথক ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময়ে যখন একে অন্যের প্রভাবে বা উভয়ে উভয়ের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে দুটি একই ব্যঞ্জনে বা প্রায় সমব্যঞ্জনে পরিণত হয় তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমীভবন বা ব্যঞ্জন সংগতি। ব্যঞ্জন সংগতি ও তিন প্রকারের, যথা—(i) প্রগত ব্যঞ্জনসংগতি, (ii) পরাগত ব্যঞ্জনসংগতি ও (iii) অন্যোন্য সমীভবন।

(i) প্রগত ব্যঞ্জন সংগতি বা সমীভবন — যেমন পদ্ম > পদ্দ, চন্দন > চন্নন , গলদা > গল্লা প্রভৃতি।

(ii) পরাগত ব্যঞ্জনসংগতি — গল্প > গপ্প, ধর্ম > ধম্ম, কর্ম > কম্ম , সুত্র > সুত্ত প্রভৃতি।

(iii) অন্যোন্য সমীভবন — উদশ্বাস > উচ্ছ্বাস, কুৎসা > কুচ্ছা, মহৎসব > মোচ্ছব প্রভৃতি।

ধ্বনি পরিবর্তনের ধারাগুলি রেখাচিত্রের মাধ্যমে সংক্ষেপে দেখানো হল -

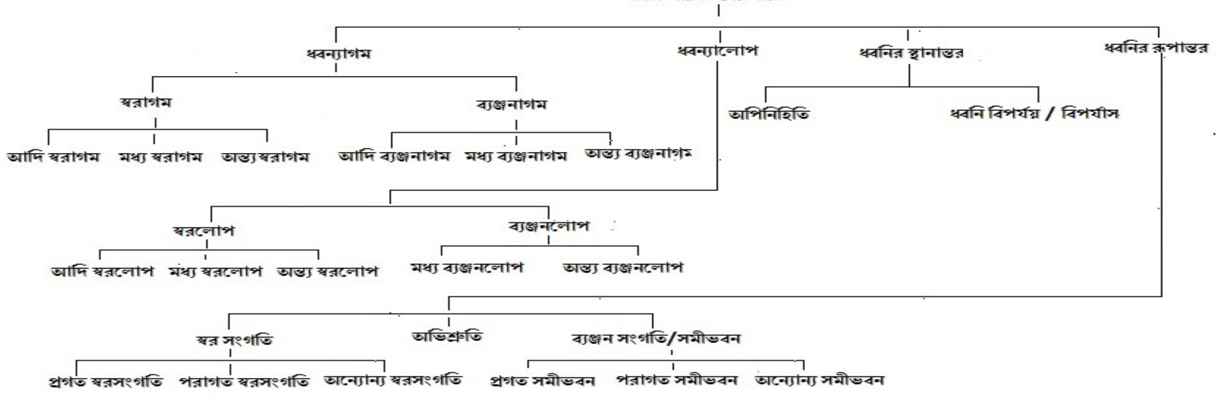

পরিবর্তনের ধারা

অপিনিহিতি [Epenthesis] —অপিনিহিতি শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল — (অপি-নি-√ধা+তি) অর্থাৎ শব্দের আগে বসা বা আগে স্থাপন । শব্দ মধ্যস্থ কোনো ব্যঞ্জন ধ্বনির পর যদি ই-কার বা উ-কার থাকে তবে সেই 'ই' বা 'উ' যদি ব্যঞ্জন ধ্বনির আগে উচ্চারিত হয়ে যে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটায় সেটাই হল অপিনিহিতি । যেমন আজি > আইজ অর্থাৎ আ+জ+ই ছিল অপিনিহিতিতে আ+ই+জ হয়েছে তেমনি করিয়া > কইরা, ক+র+ই+র+আ কিন্তু অপিনিহিতিতে হয়েছে ক+ই+র+আ । আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে কয়েকটি উদাহরণ দিলে —

ই-কারের অপিনিহিতি—রাতি > রাইত, আজকালি > আইজকাইল, শুনিয়া > শুইন্যা , চারি > চাইর ইত্যাদি ।

উ-কারের অপিনিহিতি—সাধু > সাউধ, গাছুয়া > গাউছুয়া > গাউছ্যা , চক্ষু > চউখ ।

য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের অপিনিহিতি : পথ্য > পইথ্য, বাক্য > বাইক্ক , সত্য > সইত্ত, খাদ্য > খাইদ ইত্যাদি ।

ক্ষ, জ্ঞ সংযুক্ত বর্ণ দুটির অন্তর্নিহিত ই-কারের অপিনিহিতি — দক্ষ > দইকখ, মোক্ষ > মোইকখ, যজ্ঞ > যইগ্গ ইত্যাদি ।

বাংলাভাষার অপিনিহিতির প্রয়োগ সপ্তদশ শতাব্দীর আগে তেমন প্রচলিত ছিল না । উত্তর মধ্যযুগের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী কিছু কিছু এই রীতি চর্চা লক্ষ্য করা যায় । যেমন "ঘষিয়া মাজিয়া বাপু কর্যাছ উজ্জ্বল " । চন্ডীমঙ্গল কাব্যে লেখা আছে । তেমনি জ্ঞানদাসের পদাবলী সাহিত্যেও অপিনিহিতির প্রচলন রয়েছে— "যে পণ কর্যাছি মনে । সে যে করিব ।" বর্তমানে বাংলা ভাষায় অর্থাৎ লেখ্য বাংলা ভাষায় এই অপিনিহিতির কোনো প্রয়োগ নেই । বাংলা ভাষায় 'বঙ্গালী' উপভাষায় এই রীতির প্রয়োগ আছে । বাংলাদেশে অপিনিহিতির প্রচলন বেশি লক্ষ্য করা যায় । তবে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলি জেলায় গ্রাম্য ভাষায় উচ্চারণে অপিনিহিতির প্রচলন লক্ষ্য করা যায় । যেমন বেড়িয়ে > বেইড়ে, দাঁড়িয়ে > দাঁইড়ে, পালিয়ে > পাইলে, তাড়িয়ে > তাইড়ে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয় । তবে লেখার ভাষায় এর প্রয়োগ হয় না ।

স্বরসংগতি [Vowel Harmony]— স্বরসঙ্গতি কথাটির অর্থ হল স্বরের সাম্য বা স্বরের সংগতি । চলিত বাংলায় কোনো কোনো শব্দে পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি বা পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পুর্ববর্তী স্বরধ্বনি বা উভয় ধ্বনির পরস্পর প্রভাবে যে পরিবর্তন ঘটে তখন সেই পরিবর্তনকে বলা হয় স্বরসঙ্গতি । যেমন- হিসাব > হিসেব, ফিতা > ফিতে , পূজা > পুজো , লিখা > লেখা, শুনা > শোনা ।

প্রকারভেদ — স্বরসঙ্গতি তিন প্রকার - (১) প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive), (২) পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regressive) ও (৩) অন্যান্য বা পারস্পরিক স্বরসঙ্গতি (Mutual) ।

(১) প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive) —পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বর পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় এক্ষেত্রে । যেমন- ঠিকা > ঠিকে , নৌকা > নৌকো , শিক্ষা > শিক্ষে , ধুলা > ধুলো , পূজা > পূজো, মুঠা > মুঠো প্রভৃতি ।

(২) পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regressive) — পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বর পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় । যেমন - নাই > নেই, শুনা > শোনা ,বেটি > বিটি , সন্ন্যাসী > সন্নিসি প্রভৃতি ।

(৩) অন্যান্য বা পারস্পরিক স্বরসঙ্গতি (Mutual) —পূর্ববর্তী মূর্তি এবং পরবর্তী দুটি স্বর পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যদি একই বা কাছাকাছি উচ্চারণ স্থানের দুটি স্বরে রূপান্তরিত হয়, তবে অন্যান্য স্বরসঙ্গতি হয় । যেমন যদু > যোদো, মোজা > মুজো ।

সমীভবন বা সমীকরণ বা ব্যঞ্জন সংগতি (Assimilation) —কথ্য বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জন সংগতির ব্যবহার বা প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । ব্যঞ্জন সংগতি বা সমীভবন বা সমীকরণ কথাটির অর্থ হল সমান হওয়া বা সমান করা ।

শব্দমধ্যস্থিত যুগ্ম বা পাশাপাশি অবস্থিত দুটি পৃথক ব্যঞ্জনধ্বনি যখন একে অপরের প্রভাবে বা উভয় উভয়ের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে দুটি একই ব্যঞ্জনে পরিণত হয় অথবা উচ্চারণগত সমতা লাভ করে, তবে সেই ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বলে সমীভবন বা সমীকরণ । উচ্চারণকে সরল ও সহজ করার জন্যই এই সমীভবনের জন্ম । সমীভবনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা — (১) প্রগত সমীভবন (Progressive Assimilation), (২) পরাগত সমীভবন

(Regressive Assimilation) ও (৩) অন্যান্য বা পারস্পরিক সমীভবন (Mutual Assimilation) ।

(১) প্রগত সমীভবন (Progressive Assimilation) — পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যখন একই রকম বা কাছাকাছি একই রকম ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে বলা হয় প্রগত সমীভবন । যেমন,- পদ্ম > পদ্দ , চন্দন > চন্নন, গলদা > গললা, সুত্র > সুত্ত, বাক্য > বাক্ক প্রভৃতি ।

(২) পরাগত সমীভবন (Regressive Assimilation)—পরবর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরাগত সমীভবন বলে । যেমন - গল্প > গপ্প, দুর্গা > দুগ্গা, ধর্ম > ধম্ম, জন্ম > জম্ম মুর্খ > মুখখ প্রভৃতি ।

(৩) অন্যান্য বা পারস্পরিক সমীভবন (Mutual Assimilation)—পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রভাবে পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটে তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে অন্যোন্য সমীভবন । যেমন - উৎশ্বাস > উচ্ছাস, মহোৎসব > মোচ্ছব, কুৎসা > কেচ্ছা, সত্য > সচ্চ > সাচ প্রভৃতি ।

তথ্যসূত্র ঃ ইন্টারনেট